দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ)

'ইবাদত' আরবি শব্দ। এর অর্থ দাসত্ব, বন্দেগি, আনুগত্য ইত্যাদি। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুলুল্লাহ (স.) প্রদর্শিত পন্থায় জীবন পরিচালিত করাকেই ইবাদত বলে। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ ইত্যাদি আমরা যেমনি ইবাদত হিসেবে পালন করে থাকি, তেমনি জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামি বিধি-বিধান মোতাবেক সম্পন্ন করাও ইবাদতের অংশ। আল্লাহ জিন ও মানবসন্তানকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ইমাম ও মুক্তাদির দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার সালাতের পরিচয় – মাসবুকের সালাত, মুসাফিরের সালাত, রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত, জুমুআর সালাত, ঈদের সালাত, জানাযার সালাত, তারাবিহের সালাত, তাহাজ্জুদের সালাত, আওয়াবিনের সালাত ও ইশরাকের সালাত সম্পর্কে বলতে পারব।
- সালাতের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাওমের ধারণা, প্রকারভেদ এবং সাওম ভঙ্গের কারণ, সাওম মাকরুহ হওয়ার কারণ, সাওমের কাযা ও কাফ্ফারা সম্পর্কে বলতে পারব।
- সাহারি ও ইফতারের পরিচয়, সময়সূচি ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ইতিকাফ এবং সাদাকাতুল ফিতরের ধারণা, তাৎপর্য ও আদায়ের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাওমের নৈতিক উপকার সম্পর্কে বলতে পারবে। বাস্তব জীবনে সংযম, সহমর্মিতা ও সহিষ্ণুতা অনুশীলনে সাওমের (রোজার) গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ ১

সালাত (اَلصَّلٰوةُ)

ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সালাত বা নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে সালাত। সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে।

সালাত হচ্ছে জান্নাতের চাবিকাঠি ও আল্লাহর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম। সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্মকাণ্ড হতে বিরত রাখে। সালাতের প্রভাবে মানুষ শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হয় এবং ধনী-গরিব, সাদা-কালো মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়।

জামাআতে সালাত

জামাআত আরবি শব্দ। এর অর্থ একত্রিত হওয়া, সমবেত হওয়া প্রভৃতি। ইসলামি পরিভাষায়, নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় মুসলিম সম্প্রদায় ইমামের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করাকে জামাআতে সালাত আদায় বলে।

জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব

ফরজ সালাত একাকী আদায় করার চেয়ে জামাআতে আদায় করার প্রতি বিশেষ তাগিদ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

অর্থ : "তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪৩)

নবি করিম (স.) জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, 'একাকী সালাত আদায় অপেক্ষা জামাআতে আদায় করলে সাতাশগুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।' (বুখারি ও মুসলিম)। জামাআতে সালাত আদায়কারীকে নবি করিম (স.) খুবই পছন্দ করতেন। তিনি নিজে কখনো জামাআত ত্যাগ করেননি। আবার কেউ জামাআতে উপস্থিত না হলে তিনি খোঁজ নিতেন এবং এতে মহানবি (স.) অসন্তুষ্ট হতেন। তাই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন ও অধিক সাওয়াব পাওয়ার আশায় প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে জামাআতে সালাত আদায় করতে হবে।

ইমাম

ইমাম অর্থ নেতা। যিনি সালাত পরিচালনা করেন, তিনিই ইমাম। অন্য কথায়, জামাআতে সালাত আদায়ের সময় মুসল্লিগণ (মুক্তাদি) যাকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করে, তাকে ইমাম বলে। যার কিরাআত শুদ্ধ, সুন্দর ও ইসলামি জ্ঞান বেশি এবং বয়সে বড় তিনিই ইমাম হওয়ার যোগ্য। তাই একজন যোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নির্বাচন করা উচিত।

ইমামের কর্তব্য

ইমামের কর্তব্য হচ্ছে সালাতে কাতার সোজা হলো কি না সেদিকে দৃষ্টি রাখা। মুসল্লিদের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা করা। সৎ উপদেশ দেওয়া এবং মুসল্লিদের প্রতি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। ইমাম হিংসা, বিদ্বেষ, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ইসলাম বহির্ভূত কাজকর্ম থেকে দূরে থাকবেন। তাঁর উচিত মুসল্লিদের অবস্থা দেখে সালাতে তিলাওয়াত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত করা। মুসল্লিদের মধ্যে অনেকে বৃদ্ধ, রুগ্ণ, দুর্বল ও মুসাফির থাকতে পারে, তাই ইমামকে সকলের প্রতি লক্ষ্য রেখে সালাত আদায় করতে হবে। জামাআতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষকে শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা ও নেতার প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দেয়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে এবং সামাজিক ঐক্যের প্রতিফলন ঘটায়।

মুক্তাদি

ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে অনুসরণপূর্বক যারা সালাত আদায় করে, তাঁদের মুক্তাদি বলা হয়। মুক্তাদি এই বলে সালাতের নিয়ত করবে যে, 'আমি এই ইমামের পেছনে সালাত আদায় করছি।' সালাতের যাবতীয় কাজে মুক্তাদিকে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। মুক্তাদিগণ ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। যদি মুক্তাদি একজন হয় তবে ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে। যদি ইমাম তিলাওয়াতে ভুল করেন, তাহলে মুক্তাদি সংশোধন করে দেবে। আর যদি অন্য কোনো কাজে ভুল করেন, যেমন: দাঁড়ানোর পরিবর্তে বসে, বসার পরিবর্তে দাঁড়ায়, তবে 'সুব্‌হানাল্লাহ্' বলে ইমামকে সংশোধন করে দেবে। (বুখারি)।

সালাত শেষে মুসল্লিগণ একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করবে। নিয়মিত কোনো মুসল্লি অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ খবর নেবে। নিয়মিতভাবে উক্ত অভ্যাস চর্চা করলে গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে। ইমামের ভুল হলে বিরোধিতা না করে সংশোধনের জন্য সহযোগিতা করবে।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে ইমাম ও মুক্তাদির কর্তব্যগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।
বাড়ির কাজ: জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

পাঠ ২

বিভিন্ন প্রকার সালাত

মাস্‌বুকের সালাত (صَلٰوةُ الْمَسْبُوْقِ)

যে ব্যক্তি নামাযে এক বা একাধিক রাকআত শেষ হওয়ার পর ইমামের সাথে জামাআতে অংশগ্রহণ করে, তাকে মাস্‌বুক বলে।

মাস্‌বুকের সালাত আদায়ের নিয়ম

মুসল্লি জামাআতে সালাত আদায় করতে গিয়ে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থাতেই নিয়ত করে নামাযে অংশগ্রহণ করবে। তারপর ইমামের সাথে যথারীতি রুকু সিজদাহ্ করে তাশাহ্‌হুদ পাঠের জন্য বসে যাবে। ইমাম সালাম ফিরালে সে মুসল্লি সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো রুকু, সিজদাহ্ করে যথারীতি তাশাহ্‌হুদ, দরুদ, দোয়া মাসূরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করবে। রুকুসহ ইমামের সাথে যে কয় রাকআত পাওয়া যায় তা আদায় হয়ে যায়। রুকুর পর ইমামের পেছনে ইক্তেদা বা নামাযে দাঁড়ালে ঐ রাকআত মাস্‌বুককে আদায় করতে হবে।

মুক্তাদির সালাত এক, দুই, তিন, চার রাকআত ছুটে গেলে, তা আদায়ে কিছুটা তারতম্য রয়েছে।

নিম্নে এসবের বর্ণনা করা হলো :

মুক্তাদি ইমামের পেছনে ইক্তেদা করার আগে যদি এক রাকআত ছুটে যায়, তবে ইমামের সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া এক রাকআত একাকী সালাত আদায়ের ন্যায় আদায় করে নেবে।

দুই রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া দুই রাকআত যথানিয়মে আদায় করবে, যেভাবে ফজরের দুই রাকআত ফরজ সালাত একাকী আদায় করা হয়।

তিন রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। এক রাকআত যথানিয়মে আদায় করে প্রথম বৈঠক করবে। এ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পর আবার দাঁড়িয়ে যাবে এবং বাকি দুই রাকআত যথানিয়মে আদায় করে শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দরুদ, দোয়া মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।

চার, তিন, দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদি ইমামকে শেষ বৈঠকে পেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। যথানিয়মে ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো এমনভাবে আদায় করে নেবে, যেভাবে একজন মুসল্লি একাকী চার, তিন, দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায় করে থাকে।

দলগত কাজ : কোনো এক শিক্ষার্থী মাগরিবের নামায আদায় করতে মসজিদে গিয়ে ইমামের সাথে এক রাকআত পেয়েছে। অবশিষ্ট নামায কীভাবে আদায় করবে? শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

মুসাফিরের সালাত (صَلٰوةُ الْمُسَافِرِ)

'মুসাফির' আরবি শব্দ। এর অর্থ ভ্রমণকারী। কমপক্ষে ৪৮ মাইল বা প্রায় ৭৮ কিলোমিটার দূরবর্তী কোনো স্থানে যাওয়ার নিয়তে কোনো ব্যক্তি তার নিজ এলাকা/শহর থেকে বের হলে শরিয়তের পরিভাষায় তাকে মুসাফির বলে। এমন ব্যক্তি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কমপক্ষে পনেরো দিন অবস্থানের নিয়ত না করা পর্যন্ত তার জন্য মুসাফিরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। শরিয়তে মুসাফিরকে সংক্ষিপ্ত আকারে সালাত আদায়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই সংক্ষিপ্তকরণকে আরবিতে কসর বলা হয়। মুসাফির অবস্থায় যোহর, আসর ও এশার ফরজ সালাত কসর পড়তে হয়। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ

অর্থ : "যখন তোমরা দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০১)

মুসাফিরের জন্য কসর সালাত আদায় করার অনুমতি আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন: 'এটি একটি সাদাকা, যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (মুসাফিরদের) দান করেছেন। এ সাদাকা তোমরা গ্রহণ কর।' (বুখারি ও মুসলিম)

মুসাফিরের সালাত আদায়ের নিয়ম

চার রাকআত বিশিষ্ট অর্থাৎ যোহর, আসর ও এশার ফরজ সালাত মুসাফির ব্যক্তি দুই রাকআত করে আদায় করবে। ফজর, মাগরিব ও বিতরের নামাযে কসর নেই। এগুলো পুরোপুরি আদায় করতে হবে।

আল্লাহর দেওয়া সকল সুযোগ-সুবিধা খুশি মনে গ্রহণ করা উচিত। কাজেই কোনো মুসাফির ব্যক্তি যদি ইচ্ছে করে যোহর, আসর বা এশার ফরজ সালাত চার রাকআত আদায় করে, তবে আল্লাহর দেওয়া সুযোগ গ্রহণ না করায় গুনাহগার হবে। কিন্তু ইমাম যদি মুকিম (স্থায়ী) হয়, তাহলে সে ইমামের অনুসরণ করে পূর্ণ সালাত আদায় করবে। সফর একটি কষ্টকর বিষয়। তাই আল্লাহ তার বান্দার উপর সালাত সংক্ষিপ্ত করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

দলগত কাজ : মুসাফির অবস্থায় কোন কোন নামায পূর্ণ এবং কোন কোন নামায কসর পড়তে হয় তার একটি তালিকা পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত (صَلٰوةُ الْمَرِيْضِ)

রোগী বা অক্ষম ব্যক্তি যথানিয়মে সালাত আদায় করতে না পারলে, তার জন্য ইসলামে সহজ নিয়মের অনুমোদন রয়েছে। রোগীর সেই সহজ নিয়মে সালাত আদায়কে রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত বলে।

রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়ম

রুগ্ণ ব্যক্তির জন্য জ্ঞান থাকা পর্যন্ত সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। রোগ যত কঠিন হোক না কেন, সম্পূর্ণরূপে অপারগ না হলে সালাত ত্যাগ করা যাবে না। রোগীর দাঁড়াতে কষ্ট হলে বসে রুকু-সিজদাহ্‌র সাথে সালাত আদায় করবে। রুকু-সিজদাহ্ করতে অক্ষম হলে বসে ইশারায় সালাত আদায় করবে। ইশারা করার সময় রুকু অপেক্ষা সিজদায় মাথা একটু বেশি নত করতে হবে। মাথা দিয়ে ইশারা করতে হবে, চোখে ইশারা করলে সালাত আদায় হবে না। রুগ্ণ ব্যক্তিকে বসার সময় সালাতের অবস্থায় বসতে হবে। যদি রোগী এতোই দুর্বল হয় যে বসে থাকা সম্ভব নয়, তবে কিবলার দিকে পা দুটি রাখতে হবে। পা সোজা না রেখে হাঁটু উঁচু করে রাখতে হবে এবং মাথার নিচে বালিশ বা এ জাতীয় কিছু জিনিস রেখে মাথা একটু উঁচু রাখতে হবে। শুয়ে ইশারায় রুকু ও সিজদাহ্ করবে অথবা উত্তর দিকে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে এবং কিবলার দিকে মুখ রেখে ইশারায় সালাত আদায় করবে। যদি এভাবেও সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে তার উপর সালাত আর ফরজ থাকে না, মাফ হয়ে যায়। অপারগ অবস্থায় বা কেউ বেহুঁশ হয়ে পড়লে যদি চব্বিশ ঘণ্টা সময় অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বা তার চেয়ে কম সময় অতিক্রান্ত হয়, তাহলে সক্ষম হওয়ার পর রুগ্ণ ব্যক্তিকে কাযা করতে হবে। যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশি সময় অতিবাহিত হয়, তবে আর কাযা করতে হবে না। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে সালাত এমন একটি ইবাদত, যা সক্ষমতার শেষ সীমা পর্যন্ত আদায়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে। কোনোভাবেই সালাত ত্যাগ করা যায় না।

দলগত কাজ : রুগ্ণ ব্যক্তির নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

জুমুআর সালাত (صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ)

সালাত এবং জুমুআ দুটিই আরবি শব্দ। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় জুমার সালাত। শুক্রবার যোহরের সময়ে যোহরের সালাতের পরিবর্তে যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে বলা হয় জুমার সালাত। প্রতি শুক্রবার জামে মসজিদে জুমার সালাত জামাআতে আদায় করা হয়।

গুরুত্ব

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ন্যায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, মুসলিম পুরুষের উপর জুমার সালাত আদায় করা ফরজ। আর এর অস্বীকারকারী কাফির। অবহেলা করে কেউ এ সালাত আদায় না করলে সে ফাসিক হয়ে যাবে। জুমার সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থ : "হে মুমিনগণ। জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।" (সুরা আল-জুমুআ, আয়াত ৯)।

জুমার দিন সপ্তাহের উত্তম দিন। এদিনে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। এদিনে তাঁর তওবা কবুল হয়। এদিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এদিন দোয়া কবুলের উত্তম দিন। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি শুক্রবারে গোসল করে যথাসম্ভব পবিত্র হয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে জুমার সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যায়, মসজিদে গিয়ে কাউকে কষ্ট না দিয়ে যেখানে জায়গা পায় সেখানেই বসে যায়, যথাসম্ভব সালাত আদায় করে এবং নীরবে বসে মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনে, আল্লাহ তায়ালা তার বিগত জুমা হতে এ জুমা পর্যন্ত সকল (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন।' (বুখারি)

জুমার সালাত আদায় না করলে ইসলামে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। যেমন : মহানবি (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পরপর তিন জুমা ত্যাগ করে, তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয় এবং তার অন্তরকে মুনাফিকের অন্তরে পরিণত করে দেওয়া হয়।' (তিরমিযি)

জুমার সালাত আদায়ের নিয়ম

প্রথমে মসজিদে গিয়ে তাহিয়্যাতুল ওযু ও দুখুলুল মসজিদ দুই দুই রাকআত করে নফল সালাত আদায় করতে হয়। ফরজের আগে চার রাকআত কাবলাল জুমা ও পরে চার রাকআত বা'দাল জুমা আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

জুমার সালাতের জন্য দুটি আযান দেওয়া হয়। প্রথম আযান মসজিদের বাইরে মিনারে, দ্বিতীয়টি মসজিদের ভিতরে ইমাম সাহেব খুতবা দিতে মিম্বরে বসলে দেওয়া হয়। জুমার দুই রাকআত ফরজের পূর্বে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেন। মুসল্লিদের খুতবা শোনা ওয়াজিব। এ সময় কথা বলা, অনর্থক কিছু করা নিষেধ। খুতবা শেষে ইমামের সাথে দুই রাকআত ফরজ সালাত অন্যান্য ফরজ সালাতের ন্যায় আদায়

করতে হয়। জুমার ফরজের জন্য জামাআত শর্ত। জামাআত ছাড়া জুমা সালাত হয় না। কোনো কারণে জুমাতে অংশগ্রহণ করতে না পারলে যোহরের সালাত আদায় করতে হয়। কাজেই জুমার সালাত যোহরের সময়েই পড়তে হবে।

সামাজিক শিক্ষা

জুমার সালাতে এলাকার লোকজন একত্রিত হয়। পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হয় এবং কুশলাদি বিনিময়ের সুযোগ হয়। সুখে-দুঃখে একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা করার সুযোগ হয়। ইমামের পেছনে সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসল্লিগণ সালাত আদায় করে থাকে। ফলে সকলের মধ্যে সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। মুসলিম ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়। সপ্তাহে একবার মিলিত হওয়া ও নেতার আদেশ-নিষেধ শুনে, তা মেনে চলার এক অনুপম আদর্শ প্রকাশিত হয় জুমার সালাতে। গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, যথাসম্ভব পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা ও প্রথম কাতারে বসার মানসিকতা বৃদ্ধি পায়। মন প্রফুল্ল থাকে।

দলগত কাজ : জুমার সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

পাঠ ৩
ঈদের সালাত

ঈদ আরবি শব্দ।এর অর্থ আনন্দ, উৎসব ইত্যাদি। ঈদের দিন হলো মুসলমানদের মহামিলন ও জাতীয় খুশির দিন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেছেন, 'প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন আছে। আর আমাদের উৎসব হলো ঈদ।' (বুখারি ও মুসলিম)

বছরে দুটি ঈদ। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আয্হা। ঈদের দিন এলাকার মুসল্লিগণ একত্রে ঈদগাহে যান এবং দুই রাকআত ঈদের সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানান।

ঈদুল ফিতর (عِيْدُ الْفِطْرِ)

ঈদ মানে আনন্দ। আর ফিতর অর্থ সাওম বা রোযা ভঙ্গ করা। ঈদুল ফিতর অর্থ সাওম ভঙ্গের আনন্দ। সুদীর্ঘ একটি মাস আল্লাহর নির্দেশ মতো রোযা পালনের পর বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় এদিনে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আনন্দ-উৎসব করে বলে একে ঈদুল ফিতর বলা হয়। রমযানের পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন মুসলমানগণ এ উৎসব পালন করেন। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের উপর রমযান মাসে যে ইবাদত নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা পালন করার তাওফিক দান করায় মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে এদিন শুকরিয়া জানান এবং দুই রাকআত ঈদুল ফিতরের ওয়াজিব সালাত আদায় করেন।

গুরুত্ব

ঈদের দিন আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের খোঁজখবর নিতে হয়। সাধ্যমতো তাদের বাসায় মিষ্টান্ন খাদ্য যেমন : পিঠা, পায়েস, সেমাই ইত্যাদি খাবার পাঠাতে হয়। ধনী, গরিব, মিসকিন সকলের সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে হয়। এতে সকলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ঈদ আসে আনন্দের বার্তা নিয়ে, আসে সীমাহীন প্রীতি, ভালোবাসা ও কল্যাণের সংবাদ নিয়ে। সেই ঈদকে যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

ঈদুল ফিতরের দিন দুটি কাজ ওয়াজিব : ১. ফিতরা দেওয়া ২. ঈদের দুই রাকআত সালাত ছয় তাকবিরের সাথে আদায় করা।

ঈদের দিনে সুন্নত কাজ

১. গোসল করা।

২. সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৩. পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা।

৪. সালাত আদায়ের পূর্বে মিষ্টি জাতীয় খাদ্য খাওয়া।

৫. ময়দানে গিয়ে ঈদের সালাত আদায় করা।

৬. ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবির বলতে বলতে যাওয়া।

৭. এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা।

ঈদের তাকবির

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

ঈদের সামাজিক শিক্ষা : বছরে দুই দিন মহান আল্লাহ্ মানুষের জন্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তারা হিংসা–বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ইত্যাদি ভুলে গিয়ে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। রমযানের রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষের তৃষ্ণা-ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে গরিবদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। সর্বোপরি গড়তে পারে একটি শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজ।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা ঈদুল ফিতর দিনের ওয়াজিব ও সুন্নত কাজগুলোর চার্ট তৈরি করে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে।
বাড়ির কাজ : ঈদুল ফিতরের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ঈদুল আজহা (عِيْدُ الْاَضْحٰى)

'ঈদুল আজহা' শব্দদ্বয় আরবি। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় কুরবানির ঈদ। বিশ্ব মুসলিম জাতি ত্যাগের নিদর্শন স্বরূপ মহাসমারোহে পশু যবেহ করার মাধ্যমে জিলহজ মাসের দশম তারিখ যে উৎসব পালন করে থাকে,

তাকে ঈদুল আজহা বলে। আল্লাহর নবি হযরত ইব্‌রাহিম (আ.) আল্লাহর ইঙ্গিতে তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। পুত্র ইসমাঈল (আ.) ও এটাই আল্লাহর ইচ্ছা জানতে পেরে আনন্দিত চিত্তে তা গ্রহণ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানি হয়। এ স্মৃতি রক্ষার্থে মুসলমানগণ প্রতিবছর কুরবানি করে থাকেন। কুরবানির অতুলনীয় ইতিহাস স্মরণ করে মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে এদিন শপথ করে বলেন, হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির জন্য যেভাবে আমরা পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, তেমনিভাবে আমরা তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করতেও সদা প্রস্তুত আছি।

গুরুত্ব

আর্থিক সংগতিসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমানকে কুরবানি করতে হয়।এটা আল্লাহর বিধান। শুধু গোশত বা রক্তের নাম কুরবানি নয় বরং আল্লাহর নামে সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার এক আন্তরিক শপথের নাম কুরবানি। কুরবানির মাধ্যমে মুসলমানের ইমান ও তাকওয়ার পরীক্ষা হয়ে থাকে। আর এই তাকওয়াই হচ্ছে কুরবানির প্রাণশক্তি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط

অর্থ: "আল্লাহর নিকট সেগুলোর (কুরবানির পশুর) গোশত এবং রক্ত পৌছায় না বরং পৌছায় তোমাদের তাকওয়া।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৩৭)

কুরবানির গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'কুরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা কবুল হয়ে যায়।' (তিরমিযি)। তিনি আরও বলেন, 'কুরবানির পশুর প্রত্যেকটি পশমের জন্য একটি করে সাওয়াব পাওয়া যায়।' (ইবনু মাজাহ)। সামর্থ্যবান ব্যক্তি কুরবানি না করলে রাসুলুল্লাহ (স.) অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, 'যে ব্যক্তির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি না করে, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।' (ইবনু মাজাহ)। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও অশেষ পুণ্য পাওয়ার আশায় খুশি মনে কুরবানি করব।

কুরবানির গোশত বিতরণে মুস্তাহাব বিধান

কুরবানির গোশত তিন ভাগে ভাগ করে একভাগ নিজের জন্য রেখে একভাগ আত্মীয় ও প্রতিবেশীকে এবং একভাগ গরিব মিসকিনকে দিতে হয়। এতে ধনীদের সাথে গরিবরাও ঈদের আনন্দে অংশীদার হওয়ার সুযোগ পায়।

ঈদুল আজহার ওয়াজিব কাজ

১. অতিরিক্ত ছয় তাকবিরের সাথে ঈদুল আজহার দুই রাকআত সালাত আদায় করা।

২. কুরবানি করা। এছাড়া জিলহজ মাসের ৯ তারিখ ফজর হতে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর তাকবিরে তাশরিক একবার বলা ওয়াজিব। পুরুষগণ উচ্চস্বরে পড়বে আর নারীগণ নীরবে পড়বে। ঈদুল আজহার সুন্নত ঈদুল ফিতরের মতো। কেবল পার্থক্য এই যে, ঈদুল ফিতরের দিন সালাতের আগে আর ঈদুল আযহার দিন সালাত ও কুরবানির পর কিছু খাওয়া সুন্নত।

ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম

ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করা যায়। প্রথমে কাতার করে নিয়ত করবে। তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধবে। সানা পড়বে। তারপর ইমাম সাহেবের সাথে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবে। প্রত্যেক তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠবে। প্রথম দুই তাকবিরে হাত বাঁধবে না। তৃতীয় তাকবিরে অন্যান্য সালাতের ন্যায় হাত বাঁধবে। ইমাম সাহেব স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম রাকআত শেষ করে দ্বিতীয় রাকআতের রুকুতে যাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবেন। মুসল্লিরাও তাঁর সাথে তাকবির বলবে। তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেবে, হাত বাঁধবে না। চতুর্থ তাকবিরে রুকুতে যাবে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে সালাত শেষ করবে। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুটি খুতবা দেবেন। প্রত্যেক মুসল্লির খুতবা শোনা ওয়াজিব। ঈদের মাঠে যাবার পথে ঈদুল আযহার তাকবির ঈদুল ফিতরের তাকবিরের অনুরূপ। আর ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি একই, শুধু নিয়তের বেলায় আলাদা নিয়ত করতে হবে।

সামাজিক শিক্ষা

ঈদের দিনে আমরা ভেদাভেদ ভুলে যাব। বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করব। একে অন্যের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেব, পরস্পরের সাথে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলব। একে অন্যের থেকে ভালোবাসার শিক্ষা গ্রহণ করব। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতায় আমাদের জীবনকে সুন্দর করে গঠন করার শিক্ষা গ্রহণ করব। সামাজিক সাম্যের শিক্ষা গ্রহণ করব।

দলগত কাজ : ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত সমবেত ক্লাসে একজন শিক্ষার্থী আদায় করে দেখাবে, অন্যরা ভুলগুলো তাদের নিজ নিজ খাতায় লিখবে। পরে আলোচনা করবে।

পাঠ ৪

সালাতুল জানাযা (صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ)

পরিচয়

'সালাতুল জানাযা' দুটিই আরবি শব্দ। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় জানাযার সালাত বা জানাযার নামায। মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কবরস্থ করার পূর্বে চার তাকবিরসহ যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে জানাযার সালাত বলে। জানাযার সালাত ফরজে কিফায়া। এলাকার কিছুসংখ্যক লোক এ সালাত আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে সালাত আদায় হয়ে যায়। কেউ আদায় না করলে এলাকার সবাই গুনাহগার হয়। এ সালাতে রুকু-সিজদাহ্ নেই।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানুষ মরণশীল। প্রত্যেককেই একদিন না একদিন মরতে হবে। মৃত ব্যক্তির প্রতি জীবিতদের অনেক কর্তব্য আছে। মৃতকে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো, তার জানাযার সালাত আদায় করা এবং সবশেষে তাকে কবরস্থ করা একান্ত কর্তব্য। মূলত জানাযার সালাত হলো মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া। যত বেশি লোক একত্রিত

হয়ে দোয়া করবে ততই তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই জানাযার সালাতে লোকসংখ্যা যত বেশি হবে, ততই ভালো, কিন্তু লোকসংখ্যা বেশি হওয়ার জন্য জানাযা বিলম্ব করা ঠিক নয়। অধিক লোক একত্রিত করার জন্য মৃত্যুর সংবাদ চারদিকে প্রচার করা উচিত। আল্লাহর নিকট একদিন আমাদেরও ফিরে যেতে হবে, এ সালাত সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে, তার জন্য এক কিরাত (সাওয়াব) এবং যে ব্যক্তি দাফনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে, তার জন্য দুই কিরাত (সাওয়াব)। এক একটি কিরাত হলো উহুদ পাহাড় পরিমাণ।' (তিরমিযি)

জানাযার সালাত আদায়ের নিয়ম

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করিয়ে কাফন পরানোর পর ইমাম তাকে সামনে রেখে তার বুক বরাবর দাঁড়াবেন। মুক্তাদিগণ ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। তারপর মনে মনে নিয়ত করবে, 'আমি কিবলামুখী হয়ে এই ইমামের পেছনে চার তাকবিরের সাথে জানাযার সালাত ফরজে কিফায়া আদায় করছি।'

প্রথম তাকবির বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হাত বাঁধবে। পরে সানা পড়ে হাত বাঁধা অবস্থাতেই ইমামের সাথে দ্বিতীয় তাকবির বলবে। তারপর দরুদ শরিফ পড়ে ইমামের সাথে তৃতীয় তাকবির বলবে। তারপর নিম্নের দোয়াটি পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا – اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ – وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ –

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহয়িয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলামি ওয়ামান তাওয়াফ্ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ ফাহু আলাল ইমান।

এই দোয়া পড়ে চতুর্থ তাকবির বলে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে। তাকবির বলার সময় হাত উঠবে না। মৃত ব্যক্তি যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক হয়, তবে তৃতীয় তাকবিরের পর নিম্নের দোয়াটি পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারাতাঁও ওয়াজআলহু লানা আজরাঁও ওয়া জুখরাঁও ওয়াজ আলহু লানা শাফিআঁও ওয়া মুশাফ্ ফাআন।

মৃত ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা হলে পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজআলহা লানা ফারাতাঁও ওয়াজ আলহা লানা আজরাঁও ওয়াজুখরাঁও ওয়াজআলহা লানা শাফিআতাঁও ওয়া মুশাফ্ফাআহ।

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় পড়বে :

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

উচ্চারণ : বিসিমিল্লাহি ওয়াআলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ।

কবরের উপর মাটি দেওয়ার সময় পড়বে :

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

উচ্চারণ: মিনহা খালাকনাকুম ওয়াফিহা নুয়িদুকুম ওয়ামিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। (সূরা তা-হা, আয়াত ৫৫)

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের জানাযায় উপস্থিত হওয়া অন্যতম কর্তব্য। ভোগবিলাসে মত্ত উঁচু শ্রেণির মানুষ এবং সহায় সম্বলহীন দরিদ্র মানুষ উভয়কে একইভাবে সাদা কাপড়ে, খালি হাতে পরপারের যাত্রী হতে হবে – এ সালাত সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষণিকের জীবন অনাড়ম্বরভাবে কাটিয়ে ইমানসহ কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া সবার একান্ত কর্তব্য।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে জানাযার সালাতের গুরুত্ব নিয়ে শ্রেণিতে আলোচনা করবে।
বাড়ির কাজ : জানাযার সালাত আদায়ের নিয়ম বর্ণনা কর।

পাঠ ৫

সালাতুত তারাবিহ (صَلٰوةُ التَّرَاوِيْحِ)

রমযান মাসে এশার সালাতের পর বিতরের পূর্বে যে সালাত আদায় করতে হয়, তাকে সালাতুত তারাবিহ বা তারাবিহের সালাত বলে। এ সালাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। নবি করিম (স.) নিজে এ সালাত আদায় করেছেন ও সাহাবিগণকে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। সুন্নত সালাত জামাআতে আদায়ের বিধান নেই। তবে তারাবিহের সালাত জামাআতে আদায় করা সুন্নত। এ সালাত মোট বিশ রাকআত।

তারাবিহ-এর সালাত আদায়ের নিয়ম

রমযান মাসে এশার ফরজ ও দুই রাকআত সুন্নতের পর বিতরের পূর্বে তারাবিহের নিয়তে দুই রাকআত করে মোট বিশ রাকআত সালাত আদায় করতে হয়। প্রতি চার রাকআত অন্তর বসে বিশ্রাম নিতে হয়। তখন বিভিন্ন তাসবিহ পড়া যায়। নিম্নের দোয়াটিও পড়া যায়–

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ -
سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا - سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَّبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ -

উচ্চারণ : সুবহানাযিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানাযিল ইযযাতি ওয়াল আজমাতি ওয়াল হায়বাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়ায়ে ওয়ালজাবারুতে। সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যিল্লাযি লাইয়ানামু ওয়ালাইয়ামুতু আবাদান

আবাদা। সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়ারাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রুহ্।
তারাবিহের সালাত শেষ করে বিতরের সালাত রমযান মাসে জামাআতে আদায় করার বিধান রয়েছে।

তারাবিহ-এর সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

পবিত্র রমযান মাস রহমতের ও বরকতের মাস। পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় হলো রমযান মাস। সারা দিন সাওম (রোযা) পালনের পর বান্দা যখন ক্লান্ত শরীরে তারাবিহের বিশ রাকআত সালাত আদায় করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে, তখন আল্লাহ সে বান্দার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন। বান্দার জন্য এমন সুযোগ বছরে মাত্র একবারই আসে। তাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর রহমত পেতে ব্রতী হন। এ প্রসঙ্গে নবি করিম (স.) বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে আখিরাতে প্রতিদানের আশায় রমযানের রাতে তারাবিহের সালাত আদায় করবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। '(বুখারি)। তারাবিহের সালাত ছোট ছোট সূরার মাধ্যমে আদায় করা যায়। আবার কুরআন খতমের মাধ্যমেও আদায় করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে, সূরাগুলো স্পষ্ট, ধীরস্থির ও ছন্দের সাথে পড়তে হবে। রমজান মাসে তারাবিহের সালাত একত্রিত হয়ে জামাআতে আদায় করা উত্তম। এতে নামাযে ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। পূর্ণ একটি মাস পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের ফলে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, মমত্ববোধ, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ গড়ে ওঠে।

দলগত কাজ : 'তারাবিহের নামায জামাআতে আদায় করলে ভুল কম হয়।' এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

পাঠ ৬
সালাতুত তাহাজ্জুদ (صَلٰوةُ التَّهَجُّدِ)

'তাহাজ্জুদ' আরবি শব্দ। এর অর্থ রাত জাগা, ঘুম থেকে ওঠা। মধ্যরাতের পর ঘুম থেকে উঠে যে সালাত আদায় করতে হয়, তাকে তাহাজ্জুদের সালাত বলে। তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা সুন্নত। এর গুরুত্ব অপরিসীম। নবি করিম (স.) প্রতিনিয়ত এ সালাত আদায় করতেন এবং সাহাবিগণকেও আদায়ের জন্য উৎসাহিত করতেন। মহানবি (স.)-এর উপর তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের জন্য বিশেষ তাগিদ ছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ

অর্থ : "রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করুন। এ সালাত আপনার জন্য অতিরিক্ত।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৭৯)

কোনো কারণে তাহাজ্জুদের সালাত ছুটে গেলে মহানবি (স.) দুপুরের আগেই কাযা করে নিতেন।

গুরুত্ব

গভীর রাতে আরামের ঘুম ত্যাগ করে বান্দা যখন আল্লাহর নৈকট্য ও রহমত পাওয়ার আশায় তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে, তখন আল্লাহ খুবই খুশি হন। তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে বান্দার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। এ

সালাত আদায়ে পুণ্যময় জীবনের পথ প্রশস্ত হয়। আল্লাহ তায়ালা এ সালাত আদায়কারীর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

'তারা শয্যা ত্যাগ করে, তাঁদের প্রতিপালককে আশায় ও ভয়ে ভয়ে ডাকে এবং তাঁদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাঁদের জন্যে নয়নাভিরাম কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাঁদের কৃতকার্যের পুরস্কারস্বরূপ।' (সূরা আস্-সাজদাহ: ১৬, ১৭)। তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'ফরজ সালাতের পর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো তাহাজ্জুদের সালাত।' (মুসলিম)

প্রত্যেক মুমিনের উচিত তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হওয়া। তাহলেই আল্লাহ তার বান্দার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন।

তাহাজ্জুদের সময় ও আদায়ের নিয়ম

রাতের শেষার্ধে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা উত্তম। এ সালাত পড়া সুন্নত।

এ সালাত দুই রাকআত করে সুন্নত সালাতের নিয়মে আদায় করতে হয়। তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে কয়েকবার দরুদ পাঠ করা ভালো। এরপর বিতরের সালাত আদায় করা উত্তম।

দলগত কাজ : 'তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।' এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করবে।

পাঠ ৭

সালাতুল ইশরাক (صَلٰوةُ الْاِشْرَاقِ)

ইশরাকের সালাত সুন্নতে যায়িদা বা নফল। এ নামাযে রয়েছে অনেক ফজিলত। হাদিস শরিফে এর ফজিলত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। ইশরাকের সালাত দুই রাকআত করে ৪, ৬, ৮ রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়। ইশরাকের সালাতকে হাদিসে যুহার সালাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সময়

ইশরাকের সালাত ফজরের পরে আদায় করতে হয়। ফজরের সালাত আদায় করে বিছানাতে বসে কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ, তাহলিল ও দরুদ পাঠরত অবস্থায় থাকা এবং এ সময়ে কথাবার্তা বা কাজকর্ম না করাই উত্তম। সূর্য সম্পূর্ণরূপে উঠে গেলে এ সালাত আদায় করতে হয়। যদি কেউ ফজরের সালাতের পর দুনিয়ার কোনো আবশ্যকীয় কাজকর্ম করে এ সালাত আদায় করে, তবে তাও আদায় হবে। তবে সাওয়াব কম হবে। আমরা আল্লাহর নৈকট্য ও অধিক পুণ্য লাভের আশায় এ সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হবো।

সালাতুল আওয়াবিন (صَلٰوةُ الْاَوَّابِيْنَ)

এ সালাতও সুন্নতে যায়িদা। হাদিসে আওয়াবিন সালাতের অনেক ফজিলত বর্ণিত আছে। এ সালাত নিয়মিত আদায় করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়।

সময় ও আদায়ের নিয়ম

আওয়াবিনের সালাত মাগরিবের ফরজ ও দুই রাকআত সুন্নতের পর থেকে এশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়। আওয়াবিনের সালাত দুই রাকআত করে ছয় রাকআত পড়তে হয়। আমরা অধিক সাওয়াবের আশায় এ সুন্নত সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হব।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা ইশরাক ও আওয়াবিন সালাতের সময় ও রাকআত সংখ্যা ছক আকারে পোস্টারে লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের নৈতিক শিক্ষা

সালাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত ও কল্যাণপ্রসূ উপহার। সালাত মানুষকে সকল পাপাচার, অশ্লীলতা ও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের অন্ধমোহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখে। মহান আল্লাহ বলেন –

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط

অর্থ : "নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

সালাত এক বড় নিয়ন্ত্রক শক্তি। প্রকৃত সালাত আদায়কারী মসজিদের বাইরে কোলাহল এবং দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তেও কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে না। সালাত মূলত বান্দার প্রতিটি গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। দুর্বল মন কখনো শয়তানের প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে পড়লে বিবেক তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিছুক্ষণ পরেই তোমাকে মসজিদে গিয়ে মহান প্রভুর দরবারে সিজদাহ্ বা মাথানত অবস্থায় উপস্থিত হতে হবে।

অপকর্ম করে তুমি কীভাবে সে দরবারে উপস্থিত হবে? এ ভাবনা তার মনে প্রবল হয়ে উঠলে সে আর অন্যায় পথে পা বাড়াতে পারে না। শয়তানি প্রলোভন হতে রক্ষা পায় এবং পুণ্যের পথে ফিরে আসে। প্রত্যেক মুসলমান যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতে আদায় করে, তাহলে অবশ্যই তাদের নৈতিকতার উন্নতি হবে। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি বা অনিয়মের আশ্রয় নেবে না। বরং তারা হয়ে উঠবে এ জাতির আদর্শ মানবসম্পদ।

দলগত কাজ : 'সালাতের নৈতিক শিক্ষা একজন মানুষকে কর্তব্যপরায়ণ করে তোলে'। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে আলোচনা করবে।

সালাতের সামাজিক শিক্ষা

জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার সামাজিক গুরুত্ব অনেক। ইমামের পেছনে সালাত আদায়ের অর্থ নেতার অনুসরণ। জামাআতে সালাত আদায়ের ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকে না। রাজা-প্রজা, ধনী–গরিব, ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত একই সারিতে দাঁড়ায়। এতে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের

প্রতিফলন ঘটে। দৈনিক পাঁচবার জামাআতে সালাত আদায় করলে পরস্পরের খোঁজখবর নেওয়া যায়, বিপদাপদে একে অপরের সাহায্য করা সম্ভব হয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় হয়। তারা সামাজিক দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট হয়। এরূপ ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের অত্যন্ত দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে, তারা জাতির অমূল্য মানবসম্পদে পরিণত হয়।

দায়িত্বশীল পদে নিয়োজিত ব্যক্তিকে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। আর সালাতই হচ্ছে এর উত্তম প্রশিক্ষণ।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বসে পরস্পর আলোচনা করে সালাতের সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৮

সাওম (اَلصَّوْمُ)

সাওমের ধারণা

'সাওম' আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরত থাকা। শরিয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোযা বলে। রমযান মাসের রোযা পালন করা মুসলমানের উপর ফরজ। যে তা অস্বীকার করবে সে কাফির হবে। বস্তুত রোযা পালনের বিধান পূর্ববর্তী সকল উম্মতের জন্য অপরিহার্য ইবাদত ছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন –

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

অর্থ : "হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হলো, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৩)

রোযা পালন করলে মানুষ পরস্পর সহানুভূতিশীল হয়। ধনীরা গরিবের অনাহারে, অর্ধাহারে জীবনযাপনের কষ্ট অনুধাবন করতে পারে। ফলে তারা দান-খয়রাতে উৎসাহিত হয়। রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষ হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, ধূমপানে আসক্তি ইত্যাদি বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে। হাদিসে বর্ণিত আছে –

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ

অর্থ : 'সিয়াম হচ্ছে ঢালস্বরূপ।' (বুখারি)

কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হলো রোযা। রোযা পালনের মাধ্যমে পানাহারে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এতে অনেক রোগ দূর হয়। স্বাস্থ্য ভালো থাকে। রোযার ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।'

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৫)। এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, রমযান মাসে কুরআন নাজিল হয়েছে বলে এটি অতি পবিত্র মাস। হাদিসে কুদসিতে আছে–

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

অর্থ : 'সাওম কেবল আমারই জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো।' (বুখারি)। অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'জান্নাতের রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।' (বুখারি)। রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং আখিরাতে সাওয়াবের আশায় সাওম পালন করে, তার অতীত জীবনের সকল (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)। এ মাস ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। এ মাসে মুমিনের রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোনো রোযা পালনকারীকে ইফ্তার করাবে, সে তার রোযার সমান সাওয়াব পাবে। অথচ রোযা পালনকারী ব্যক্তির সাওয়াবে বিন্দুমাত্র ঘাটতি হবে না। ফজিলতের দিক দিয়ে রমযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাতের এবং শেষ অংশ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার।

সাওমের (রোযার) প্রকারভেদ

রোযা ছয় প্রকার। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, নফল ও মাকরুহ।

ক. ফরজ রোযা : বছরে শুধু রমযান মাসের রোযা পালন করা ফরজ এবং এর অস্বীকারকারী কাফির। রমযানের রোযার কাযাও ফরজ। বিনা ওযরে এ রোযা ত্যাগকারী ফাসিক ও গুনাহগার হবে।

খ. ওয়াজিব রোযা : কোনো কারণে রোযা পালনের মানত করলে তা পালন করা ওয়াজিব। কোনো নির্দিষ্ট দিনে রোযা পালনের মানত করলে সেদিনেই পালন করা জরুরি।

গ. সুন্নত রোযা : রাসুলুল্লাহ (স.) যে সকল রোযা নিজে পালন করেছেন এবং অন্যদের পালন করতে উৎসাহিত করেছেন, সেগুলো সুন্নত রোযা। আশুরা ও আরাফার দিনে রোযা পালন করা সুন্নত।

ঘ. মুস্তাহাব রোযা : চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা পালন করা মুস্তাহাব। সপ্তাহের প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এবং শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা পালন করা মুস্তাহাব।

ঙ. নফল রোযা : ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব ছাড়া সকল প্রকার রোযা নফল। যে সকল দিনে রোযা পালন করা মাকরুহ ও হারাম, ঐ সকল দিন ব্যতীত অন্য যেকোনো দিন রোযা রাখা নফল।

চ. মাক্রুহ রোযা: মাকরুহ দুই প্রকার। (১) মাকরুহ তাহ্রিমি, যা কার্যত হারাম রোযা। যেমন: দুই ঈদের দিনে ও জিলহজ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখে রোযা পালন করা হারাম। (২) মাকরুহ তানযিহি, যা অপছন্দনীয় কাজ। যেমন: মুহাররাম মাসের ৯ বা ১১ তারিখে রোযা পালন না করে শুধু ১০ তারিখে পালন করা। কারণ, এতে ইয়াহুদিদের সাথে সমাঞ্জস্য হয়। অনুরূপভাবে শুধু শনিবারে রোযা রাখা। কারণ, এতেও ইয়াহুদিদের সাথে মিল হয়ে যায়।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা সাওমের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ছক আকারে লিখে শ্রেণিতে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ৯

সাহারি (اَلسَّحَرِيُّ)

'সাহারি' আরবি শব্দ। যা সাহারুন শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর অর্থ ভোর, প্রভাত ইত্যাদি। রমযান মাসে রোযা পালনের উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে যে খাবার খাওয়া হয়, তাকে সাহারি বলে। সাহারি খাওয়া সুন্নত। রাসুলুল্লাহ (স.) নিজে সাহারি খেয়েছেন এবং অন্যদেরও খাওয়ার জন্য তাগিদ করতেন। মহানবি (স.) বলেছেন, 'সাহারি খাওয়া বরকতের কাজ। তোমরা সাহারি খাও।' (বুখারি)। সুবহে সাদিকের আগেই সাহারি খাওয়া শেষ করতে হবে। কিন্তু এত আগে সাহারি খাওয়া উচিত নয় যে, খাওয়ার পর অনেক সময় বাকি থাকে। ফলে অনেকে বিশ্রামের জন্য বিছানায় যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। এতে সালাত কাযা হয়ে যায়।

ইফ্‌তার (اَلْإِفْطَارُ)

'ইফ্‌তার' আরবি শব্দ। এর অর্থ ভঙ্গ করা। ইসলামি পরিভাষায় সূর্যাস্তের পর নিয়তের সাথে হালাল বস্তু পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করাকে ইফ্‌তার বলে। ইফ্‌তার করা সুন্নত। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। ইফ্‌তার করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে শুরু করা এবং 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে শেষ করা উত্তম। তবে নিম্নোক্ত দোয়াটিও পড়া যায় :

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ -

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনার জন্য সাওম পালন করেছি এবং আপনার দেওয়া রিজিক দ্বারাই ইফতার করলাম।' (আবু দাউদ)। নিজে ইফ্‌তার করার সাথে সাথে অন্যকেও ইফতার করালে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে রোযাদারের সমান সাওয়াব পাবে।' (তিরমিযি)। আমরা অধিক সাওয়াব ও আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশায় নিজে ইফতার করব এবং অন্যকেও ইফতার করাব।

সাওম ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে সাওম ভঙ্গ হয় এবং একটির পরিবর্তে একটি সাওম পালন করা ফরজ হয়, তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. ভুলবশত কিছু খেয়ে ফেলার পর সাওম ভঙ্গ হয়েছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে।

২. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় পানি পেটে গেলে।

৩. সাওম পালনকারীকে জোর করে কেউ কিছু পানাহার করালে।

৪. ভুলবশত রাত এখনো বাকি আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পর সাহারি খেলে।

৫. ইফ্‌তারের সময় হয়েছে মনে করে সূর্যাস্তের আগে ইফ্‌তার করলে।

৬. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভর্তি বমি করলে।

৭. প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তার মাধ্যমে ওষুধ বা অন্য কিছু গ্রহণ করলে।

সাওম মাকরুহ হওয়ার কারণ

সাওম মাকরুহ হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। নিম্নে কতিপয় কারণ উল্লেখ করা হলো-

১. অন্যের গিবত অর্থাৎ দোষত্রুটি বর্ণনা করলে।

২. মিথ্যা কথা বললে, অশ্লীল আচরণ বা গালমন্দ করলে।

৩. কুলি করার সময় গড়গড়া করলে। কারণ এতে গলার ভিতর পানি ঢুকে গিয়ে রোযা ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে।

৪. যথাসময়ে ইফতার না করলে।

৫. গরমরোধে গায়ে ঠান্ডা কাপড় জড়িয়ে রাখলে বা বারবার কুলি করলে।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা সাহারি ও ইফতারের সময়সূচি ও দোয়া ছক আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সাওমের (রোযার) কাযা ও কাফ্ফারা (قَضَاءُ الصَّوْمِ وَكَفَّارَتُهُ)

কাযা

কোনো কারণে অনিচ্ছায় যদি সাওম ভেঙে যায় কিংবা কোনো ওযরে তা পালন করা না হয়, তবে একটি সাওমের পরিবর্তে একটি সাওমই রাখতে হয়। একে কাযা সাওম বলে।

সাওম কাযা করার কারণসমূহ

১. সাওম পালনকারী রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে বা সফরে থাকলে অথবা অন্য কোনো ওযরের কারণে সাওম পালনে অপারগ হলে।

২. রাত মনে করে ভোরে পানাহার করলে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভর্তি বমি করলে।

৪. জোরপূর্বক সাওম পালনকারীকে কেউ পানাহার করালে।

৫. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় পানি পেটে গেলে।

৬. ভুলক্রমে কোনো কিছু খেতে শুরু করার পর সাওম নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে পুনরায় খেলে।

৭. দাঁত হতে ছোলা পরিমাণ কোনো জিনিস বের করে খেলে।

উল্লিখিত অবস্থায় সাওম নষ্ট হলেও সারা দিন না খেয়ে থাকতে হয় এবং পরে কাযা করতে হয়।

কাফ্ফারা (اَلْكَفَّارَةُ)

ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম পালন না করলে বা সাওম রেখে বিনা কারণে ভেঙে ফেললে কাযা এবং কাফ্ফারা উভয়ই ফরজ হবে।

সাওমের কাফ্ফারা নিম্নরূপ:

১. একাধারে দুই মাস সাওম পালন করা।

২. এতে অক্ষম হলে ৬০ জন মিসকিনকে পরিতৃপ্তির সাথে দুই বেলা খাওয়ানো অথবা

৩. একজন দাসকে স্বাধীনতা প্রদান করা।

একাধারে দুই মাস কাফ্ফারার সাওম আদায়কালীন যদি মাসে দুই-একদিন বাদ পড়ে যায়, তবে পূর্বের সাওম বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় নতুন করে শুরু করে দুই মাস বিরতিহীনভাবে সাওম পালন করতে হবে।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা সাওম কাযা ও কাফ্ফারার কারণ পৃথকভাবে পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১০

ইতিকাফ (اَلْاِعْتِكَافُ)

'ইতিকাফ' আরবি শব্দ। এর অর্থ অবস্থান করা, আটকে থাকা। শরিয়তের পরিভাষায় সাংসারিক কাজকর্ম ও পরিবার থেকে আলাদা হয়ে মসজিদে ইবাদতের নিয়তে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলা হয়।

ইতিকাফ সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া। এলাকাবাসীর মধ্য থেকে একজন আদায় করলেই আদায় হয়ে যাবে। আর কেউ আদায় না করলে সকলেই দায়ী হবে। ইতিকাফকারী দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়। ফলে সে অনর্থক কথাবার্তা ও যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে থাকে। আল্লাহর সাথে মনের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। একাগ্রচিত্তে কয়েক দিন ইবাদতের ফলে তার মনে আল্লাহর ভীতি গভীরভাবে সৃষ্টি হয়। ফলে দুনিয়ার চাকচিক্য তাকে আল্লাহর যিকর (স্মরণ) হতে দূরে সরাতে পারে না। ইবাদতে তার মনে শান্তি আসে। ইতিকাফের ফজিলত অনেক। রাসুলুল্লাহ (স.) নিয়মিতভাবে প্রতিবছর ইতিকাফ করতেন। হাদিসে আছে, 'রাসুলুল্লাহ (স.) প্রতি রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। এ আমল তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত বহাল ছিল। মহানবি (স.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর বিবিগণও এ নিয়ম পালন করেন।' (বুখারি)

রমযান মাসে লাইলাতুল কদর নামে একটি বরকতময় রাত আছে। যে রাত হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। রমযানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে লাইলাতুল কদর খুঁজতে মহানবি (স.) নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময় ইতিকাফ অবস্থায় থাকলে লাইলাতুল কদর লাভের সৌভাগ্য হতে পারে।

আদায়ের নিয়ম

রমযানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফ করা সুন্নত। এর সর্বনিম্ন সময় একদিন একরাত। রমযান মাস ছাড়াও মুস্তাহাব ইতিকাফ যেকোনো সময় পালন করা যায়। স্ত্রীলোক নিজ ঘরে নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ করতে পারেন।

দলগত কাজ : 'ইতিকাফের মাধ্যমে লাইলাতুল কদর পাওয়া সম্ভব।' দলে বিভক্ত হয়ে এ নিয়ে আলোচনার আয়োজন করবে।

সাদাকাতুল ফিতর (صَدَقَةُ الْفِطْرِ)

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সাওমের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গরিব-দুঃখীদের সহযোগিতায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সম্পদ দান করা হয়, তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে।

মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ (সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য বা সমপরিমাণ অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলে তাকে নিসাব বলে) সম্পদের মালিক প্রত্যেক স্বাধীন মুসলিম নর নারীর উপর 'সাদাকাতুল ফিতর' ওয়াজিব। শিশু ও পরাধীন (গোলাম) ব্যক্তির সাদাকা অভিভাবক আদায় করবে।

তাৎপর্য

যে বছর রোযা ফরজ হয়, সে বছরই রাসুলুল্লাহ (স.) মুসলমানদের সাদাকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেন। মুসলমানগণ পবিত্র রমযান মাসে রোযা পালন করে। আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে মশগুল থাকে। এসব দায়িত্ব পালনে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়। রোযা পালনে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তার ক্ষতিপূরণের জন্য শরিয়তে রমযানের শেষে 'সাদাকাতুল ফিতর' ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। ফিতর পেলে গরিব-অনাথ লোকেরাও ঈদের খুশিতে অংশীদার হতে পারে। এভাবেই ধনী-গরিবের মধ্যে ব্যবধান কমে আসে এবং সম্প্রীতি ও সৌহার্দ গড়ে ওঠে। হাদিসে আছে,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ

অর্থ: "রাসুলুল্লাহ (স.) যাকাতুল ফিতর আবশ্যক করেছেন রোযাদারদের অনর্থক কথা ও অশ্লিলতা থেকে পবিত্র করার জন্য ও মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য।" (আবু দাউদ)।

আদায়ের নিয়ম

ঈদের সালাতের পূর্বে নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। ঈদের দুই-একদিন আগে 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করা যায়। তবে ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে ঈদের মাঠে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করা উত্তম। ঈদের পর কেউ যদি তা আদায় করে তবে আদায় হবে কিন্তু সাওয়াব কম হবে।

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

মাথাপিছু নিসফু সা অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই কেজি গম বা যব বা তার মূল্য আদায় করতে হবে।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায়ের গুরুত্বের উপর আলোচনা করবে।

পাঠ ১১

সাওমের (রোযার) নৈতিক শিক্ষা

সাওম (রোযা) পালনের মাধ্যমে বান্দা একদিকে আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, অপরদিকে তার নৈতিকতারও বিশেষ উন্নয়ন ঘটায়। সাওমের অনেক নৈতিক শিক্ষার মধ্যে কতিপয় শিক্ষা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. সংযম

মানুষের মধ্যে যেমন ভালো গুণ থাকে, তেমনি তার মধ্যে জৈবিক ও পাশবিক শক্তিও থাকে। পাশবিক শক্তি তাকে স্বেচ্ছাচারিতার পথে পরিচালিত করে। স্বেচ্ছাচারিতার কারণে সমাজে অনাচার, কোন্দল, কলহ ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের স্বীয় প্রবৃত্তিকে সংযমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। রোযা মানুষকে এই সংযম শিক্ষা দেয়। মানুষের কুপ্রবৃত্তি তাকে তার খেয়ালখুশি মতো চলতে এবং সকল প্রকার অন্যায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। রমযানের সাওম এই অবাধ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৈধ পানাহার ও অন্যান্য জৈবিক চাহিদা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। এই সাওম চরম খাদ্যবিলাসী ও স্বেচ্ছাচারিতাকে সংযমী করে তোলে। পূর্ণ এক মাস এই সংযম মেনে চলার প্রশিক্ষণ তাকে গোটা বছর সংযমী হয়ে চলতে সাহায্য করে।

দলগত কাজ : 'মানুষের কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রোযার সংযম শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা রাখে।' শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা করবে।

২. সহমর্মিতা

যে ব্যক্তি কখনো অনাহারে থাকেনি, সে কীভাবে ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করবে? আর যে কখনো রোগাক্রান্ত হয়নি, সে কীভাবে রোগযন্ত্রণা অনুভব করবে? কোনো অভুক্ত পিপাসার্ত ভিক্ষুক বিত্তশালীদের দ্বারে উপস্থিত হয়ে যেন বিদ্রূপের শিকার না হয় - এটা রোযার অন্যতম শিক্ষা (অর্থাৎ অসহায় ক্ষুধার্তের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াও সাওমের শিক্ষা)। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, সকল মুমিন বান্দা সুবহে সাদিক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুধার জ্বালা বুঝতে পারে। গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয়, আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম থাকে, তখন ধনীর দুলাল হোক আর গরিবের সন্তান হোক ক্ষুধার জ্বালা ও পিপাসার কাতরতা সমভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। একইভাবে রোযাদার ব্যক্তির দ্বারে যখনই কোনো অনাহারী অভুক্ত মানুষ আসবে, তখন অবশ্যই তার মনে দয়া বা সহমর্মিতা সৃষ্টি হবে। ধনী ও গরিবের মধ্যে আন্তরিকতা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা সাওম পালনের মাধ্যমে যতটা বৃদ্ধি পায়, অন্য কোনো ইবাদতের মাধ্যমে এগুলো এত বেশি সৃষ্টি হয় না।

এই উপলব্ধির বাস্তবতা পরীক্ষার জন্য রোযাদার ব্যক্তিকে ইফতার করানোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একজন রোযাদার অপরকে ইফতার করানোর মানেই হচ্ছে সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ।

বাড়ির কাজ : 'গরিবের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে সাওমের সহমর্মিতা শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা রাখে' ব্যাখ্যা কর।

৩. সহিষ্ণুতা

সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য মুমিনের জন্য এক বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিগতভাবে মানুষের অন্তর থাকে অস্থির ও চঞ্চল। যদি কোনো দ্রব্য তার আওতার মধ্যে থাকে, তবে তা পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনের এ অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে নিজ ইচ্ছামতো কাজ করলে সমাজে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে। একমাত্র সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মনের কু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনাই এ ধৈর্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। রোযা পালনকারী দিনের বেলায় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছু পানাহার করে না ও অন্যায় কাজ করে না। এমনকি জৈবিক চাহিদাটুকুও দমন করে রাখে। এটি ধৈর্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। কেউ যদি অভাব অনটনের কারণে আহারাদি সংগ্রহে অপারগ হয়, তবে রোযার মাধ্যমে অর্জিত ধৈর্যই হতে পারে তার একমাত্র অবলম্বন। এতে একদিকে যেমন রক্ষা হয় ইমান, তেমনি অপরদিকে শান্ত হয় পরিবার ও সমাজ।

বাড়ির কাজ : ইবাদত অধ্যায়ের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরবর্তী জীবনে কীভাবে কাজে লাগবে তার একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মানুষকে সংযম শিক্ষা দেয় কোন ইবাদত?

ক. সালাত খ. যাকাত
গ. সাওম ঘ. হজ

২। 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায়ের মাধ্যমে –

i. সাওম পালনের সকল দোষত্রুটি দূরীভূত হয়

ii. ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়

iii. গরিবের পানাহারের ব্যবস্থা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ধনাঢ্য ব্যক্তি মুরাদ সাহেব সাহারি খেয়ে যথারীতি সাওম শুরু করলেন। দুপুরে প্রচণ্ড গরম পড়াতে ইচ্ছা করে ভাত খেয়ে নিলেন। পরবর্তীতে তিনি কাযা হিসেবে একটি রোযা আদায় করলেন।

৩. মুরাদ সাহেবের কাজের মাধ্যমে লঙ্ঘিত হয়েছে–

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নত ঘ. নফল

৪. উপযুক্ত কারণে মুরাদ সাহেবকে–

i. কাযা করতে হবে

ii. কাফ্ফারা আদায় করতে হবে

iii. একাধারে এক মাস সাওম আদায় করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জমির উদ্দিন একজন কৃষক। সারাদিন তিনি মাঠেই কাজ করেন। নামাযের সময় হলে খেতের পাশে কাপড় বিছিয়ে নামায আদায় করেন। জুমার দিন তিনি মসজিদে না গিয়ে যোহরের সালাত আদায় করেন। তার প্রতিবেশী জহির উদ্দিন তাকে বললেন জুমার নামায আদায় করার জন্য শরিয়তের কিছু বিধান রয়েছে। আজান হয়ে গেছে। আমি মসজিদে যাচ্ছি। তুমিও আমার সাথে চলো। তখন জমির উদ্দিন বলেন, মসজিদ অনেক দূরে। কাজের ক্ষতি হবে বলেই খেতের পাশে যোহর নামায আদায় করছি।

(ক) 'ইবাদত' কী?
(খ) মুসাফির বলতে কী বোঝায়?
(গ) জুমার নামাযের ব্যাপারে জমির উদ্দিনের মনোভাবে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) জুমার নামায বিষয়ে জহির উদ্দিনের বক্তব্যের যৌক্তিকতা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। আসলাম ও আসগর সপ্তম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র। পরীক্ষার সময় রমযান মাস থাকায় পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কথা ভেবে আসলাম রোযা ছেড়ে দেয়। মাঝে মধ্যে সালাত আদায়েও সে গাফলতি করে। অন্যদিকে কষ্টকর হলেও আসগর নিয়মিত রোযা পালন করে। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে ওয়াক্ত হলেই সে নামায আদায় করে নেয়। আসগর আসলামকে নিয়মিত সালাত ও সাওম পালনের ব্যাপারে বললে আসলাম বলে এই

মুহূর্তে পরীক্ষায় ভালো ফলাফলই আমার নিকট মুখ্য। পরবর্তীতে আসগর তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষককে আসলামের বক্তব্যটি জানালে তিনি তাকে সাওমের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন।

(ক) 'ইতিকাফ' কী?

(খ) 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) আসলামের মনোভাবে কী প্রকাশ পেয়েছে? শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) আসগরের কাজের পুরস্কার কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।